এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

এপ্রিল ২০০৯

BOOK POST - PRINTED MATTER

উন্নয়নের হালহকিকত ১৪/১০৭

নদনদীর সুস্বাস্থ্য যে কোনো দেশের আর্থিক বিকাশের সূচক। কৃষি, শিল্প এবং পর্যটন উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের নদনদীর অবদান অসীম। নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের গাছপালা কেটে ফেলা, অসংখ্য বাঁধ নির্মাণ এবং মানুষের অন্যান্য কাজকর্মের ফলে আমাদের দেশের নদনদীর অবস্থা শোচনীয়। ফলে বন্যার তীব্রতাও ফি বছর বাড়ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অসংখ্য মানুষ। বর্তমানে দেশের মোট ৩২ কোটি ৯০ লক্ষ হেক্টর ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে ৪ কোটি হেক্টরই বন্যা-প্রবণ এবং এই পরিমাণ বেড়েই চলেছে। যেভাবে পলি পড়ে নদীগুলি বুজে যাচ্ছে, আগামীদিনে তাতে শুধু বন্যার ক্ষতি সামাল দিতেই দেশের অর্থনীতিতে ভীষণ চাপ পড়বে। সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, দেশের ৩৮.৭ শতাংশ অঞ্চলে হেক্টর প্রতি ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ ১০ শতাংশ যা স্বীকৃত সীমার তুলনায় অনেক বেশি। প্রতি বছর নষ্ট হওয়া মাটির পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি ৪০ লক্ষ টন। যার অর্থ হল বছরে প্রতি হেক্টর জায়গা থেকে ১৬.৪ টন মাটি নষ্ট হয়। এর মধ্যে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে স্থায়ীভাবে নষ্ট হয় ২৯ শতাংশ। ১০ শতাংশ জমা হয় জলাধারে। ৫১ শতাংশ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে জমে। বাঁধগুলির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ হলেও, পলি পড়ে বেশিরভাগ বাঁধের আজ এমন অবস্থা যে বর্ষাকালে ভারী বৃষ্টি হলে নদনদী দিয়ে প্রবাহিত বাড়তি জল ধরে রাখার ক্ষমতা এখন আর এইসব বাঁধের নেই। ফলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে সেই বাড়তি জল ছেড়ে দেয়, ফলে বন্যার তীব্রতা আরও বাড়ে। আসলে পাশ্চাত্য ধারায় উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে, আমরা পরিবেশ ধ্বংস করছি। যে কোনো মূল্যে নদনদীকে বাঁচাতেই হবে। না হলে বাঁচবে না কিছুই। সে কৃষিই হোক, শিল্পই হোক বা পর্যটন ও তীর্থক্ষেত্র সংক্রান্ত বাণিজ্যই হোক।

সমন্বয়হীন বিভাগ ১৪/১০৮

ভারতে কৃষি গবেষণায় যে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে তা বোঝা যায় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দেখে। যেমন কাউন্সিলের দুটি আলাদা আলাদা বিভাগ আছে। একটির দায়িত্ব আগাছা ব্যবস্থাপনা অন্যটি দেখাশোনা করে ভেষজ উদ্ভিদ। একই ছাতার তলায় থাকলেও, দুটি বিভাগ কাজ করে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। প্রথমটি আগাছা নির্মূল করতে শক্তিশালী রাসায়নিক তৈরিতে ব্যস্ত। অন্য বিভাগটি আবার তথাকথিত কম দামি উদ্ভিদের বাণিজ্যিক প্রসারের চেষ্টায় নিয়োজিত। এইভাবে একে অপরের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবে, আগে অনেক ভেষজ উদ্ভিদকে আগাছা বলে মনে করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, অনেক উদ্ভিদ যেগুলোকে আগাছার দলে ফেলা হয়েছিল, দেখা গেছে খাদ্য হিসেবে সেইসব উদ্ভিদের মূল্য কিছু কম নয়। অথচ বাণিজ্যিকভাবে এদের উৎপাদনের প্রয়োজন আছে বলে কাউন্সিল মনে করে না। কাউন্সিল তখনই এই প্রয়োজন অনুভব করে, যখন সরকার অথবা সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে এক্ষেত্রে কোনো বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেছে, এই ধরনের প্রকল্পে সাধারণ মানুষের উপযোগী খাদ্য এবং তার পুষ্টিগুণের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। কাউন্সিলের দৃষ্টিভঙ্গীর আরও একটি দুর্বলতার দিক হল, কৃষির সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রকে একযোগে গুরুত্ব না দেওয়া। যেমন শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগাছারও গুরুত্ব রয়েছে।

কারণ সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে। তাছাড়া মাটিতে সবুজ সার হিসেবে আগাছা 'মালচ' হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার স্বার্থে তাই আইসিএআর কে 'আগাছা'র বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

রাসায়নিকের দাসত্ব ১৪/১০৯

আমরা যত আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি, আমাদের অজান্তেই আমরা জড়িয়ে পড়ছি নানান দূষণের বেড়াজালে। রাসায়নিকের কথাই ধরা যাক। বলতে গেলে রাসায়নিকের সমুদ্রে আমরা ভাসছি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্যে ৮০ হাজার রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়, যার বেশিরভাগেরই স্বাস্থ্যের উপর কী ধরনের দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সে ব্যাপারে কোনো পরীক্ষাই হয়নি। সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, এই বিশাল তালিকা থেকে কোনটা ব্যবহার করা উচিত নয় তা খুঁজে বের করা। বাথরুম বা স্নানের ঘরে বহু উপকরণ ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে ফরম্যালডিহাইড, সালফারের যৌগ, অ্যামোনিয়া, অ্যালুমিনিয়াম, সীসা এবং পেট্রোকেমিক্যালস এর মতো অসংখ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তু। আমরা যে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করি তার মধ্যে থাকে ডাইইথানলামাইন, ট্রাইইথানলামাইন এবং মোনোইথানলামাইনের মতো রাসায়নিক যা থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। এমন কী দীর্ঘদিন বেশি পরিমাণ ডিটারজেন্টের সংস্পর্শে থাকলে, লিভার ও কিডনিতে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইদানিং প্রায় সকল খাদ্যবস্তুতে সিনথেটিক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হচ্ছে, এর ফলে খাদ্যবস্তু পচনের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকে। পরীক্ষায় প্রমাণিত, এর থেকে বিশেষ করে বাচ্চাদের নানান জটিল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া অনেক খাদ্যবস্তুকে সুগন্ধী করতে এবং স্বাদ বাড়াতে মোনোসোডিয়াম গ্লুটামেট ব্যবহার করা হয়, যার দরুন দেহের ওজনের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মাইগ্রেন, হাঁপানি ও ডায়াবিটিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

জল সংরক্ষণে উদ্যোগী 'মানব চেতনা' ১৪/১১০

উত্তর ২৪ পরগনার 'মানব চেতনা' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জল সংরক্ষণে সাধারণের মধ্যে দায়িত্ববোধ বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। সংস্থার মুখপাত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিন সায়েন্স বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী, কলকাতার ভূগর্ভস্থ জলস্তর ৫০ বছরে ৭ থেকে ১১ লিটার নেমে গেছে। ফলে কলকাতা পুরসভাকে কেবল কলকাতাতেই ৩২ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ করতে হচ্ছে। এছাড়া কলকাতা এবং সন্নিহিত পুরসভাগুলির চাহিদা মেটাতে দৈনিক মাটির নীচ থেকে ৪১ কোটি ১০ লক্ষ গ্যালন তুলে নিচ্ছে। শহর ও শহরের আশপাশের জলাশয়গুলি বুজিয়ে ফেলার ফলে খরচ হয়ে যাওয়া জলের একটা বিপুল অংশ আর পূরণ হচ্ছে না। ফলে মাটির নীচে সৃষ্টি হচ্ছে এক বিরাট শূন্যতার। নদীনালাগুলিও শুকিয়ে যাচ্ছে। এই সবের মিলিত কারণে আগামীদিনে শহর এবং শহরতলিতে ভয়ঙ্কর জল সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা। রাজ্যের গ্রামগুলিতেও সেচের কাজে ব্যবহৃত জলের ৫০ শতাংশই মাটির নীচ থেকে পাম্প করে তুলে নেওয়া হয়। গ্রামে ঘর-গৃহস্থলিতে জলের চাহিদার ৮০ শতাংশই মেটানো হয় ভূগর্ভস্থ জল দিয়ে। সংগঠনটির মতে, জলের অপচয় রোধ করা, ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের পরিমাণে রাশ টেনে ধরা এবং পাশাপাশি বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করাই হবে, ভবিষ্যতের সংকটজনক পরিস্থিতির থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়।

রোগজীবাণু প্রতিরোধে ডাব ১৪/১১১

ডাবের জলের ব্যাপারে নতুন করে কিছু বলার নেই। সুস্বাদু এই পানীয়টি শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে নয়, গোটা এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার মানুষের কাছে এটি সমান প্রিয়। তবে কেবল পানীয় হিসাবেই নয়, ডাবের জলের মধ্যে বিজ্ঞানীরা ঔষধি গুণও খুঁজে পেয়েছেন। ডায়ারিয়াতে এর জল উপকার দেয়। এটি হার্টের পক্ষেও ভালো। এখন আবার জানা গেছে ডাবের জল ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সক্ষম। বছরের পর বছর ব্যবহার করার ফলে, চলতি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ রোগ জীবাণু প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় বিজ্ঞানীরা নজর দিয়েছেন শরীরে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মূল বস্তু বিভিন্ন প্রোটিনের প্রতি। যখন কোনো রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে, আমাদের দেহের প্রতিরোধ কোষ প্রোটিন দিয়ে তৈরি অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। বিজ্ঞানীরা গাছপালার বিভিন্ন অংশ যেমন ফুল, পাতা, মূল ইত্যাদি থেকে রোগ জীবাণু ধ্বংসকারী প্রোটিন তৈরি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ও ব্রাজিলের একদল গবেষক ডাবের জলের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন তিনটি নতুন ধরনের বিভিন্ন গুণসম্পন্ন পেপটাইজম যা নানান ব্যাকটেরিয়া যারা খাদ্যকে বিষিয়ে দেয়, দুধ ও মাংসকে নষ্ট করে তাদের মেরে ফেলে। আগামীদিনে ওইসব পেপটাইজম ভবিষ্যতের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হবে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন।

দূষণ রক্ষাকর্তা তুলসী ১৪/১১২

ঔষধি গুণের জন্য তুলসীকে ঈশ্বর রূপে পুজো করা হয়। সেই তুলসীকে এখন কাজে লাগানো হবে তাজমহলের দূষণ রোধে। উত্তরপ্রদেশের বন দফতর ও লখনউস্থিত অর্গ্যানিক ইন্ডিয়া নামে একটি বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে, বিশ্বের এই অনুপম

স্থাপত্যের চারপাশ ঘিরে লাগানো হয়েছে ১০ লক্ষ তুলসী। সংগঠনের মুখপাত্রের মতে, পরিবেশ নির্মল করায় তুলসীর তুলনা মেলা ভার। এই উদ্ভিদটি প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেনের জোগান দেয়। তাজমহলের অদূরে যে তৈল শোধনাগার রয়েছে যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়া দূষিত গ্যাস তাজমহলের গায়ে ছোপ ধরিয়েছে। তুলসী এই বায়ুদূষণ রোধ করে তাজমহলকে রক্ষা করবে।

নিপাত যাক জিন ফসল

১৪/১১৩

জিন ফসল ভালো কী মন্দ, সেই ব্যাপারে বিশ্ব জুড়ে গবেষণা চলছে। এই জিন ফসল শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ কিনা এখনও পর্যন্ত প্রমাণ মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে দেশের নানান প্রান্তে দাবি উঠেছে আমাদের গিনিপিগ করা চলবে না। যেমন বিটি বেগুন নামে জিন প্রযুক্তিতে তৈরি বেগুন চাষের বিরুদ্ধে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাদ ও প্রচার আন্দোলন গড়ে উঠছে। প্রচারে শ্লোগান দেওয়া হয়েছে— 'আমি গবেষণাগারের ইঁদুর নই'। অভিযোগ উঠেছে কোনো গবেষণা ছাড়াই মার্কিন মুলুকের কোম্পানি মনসানতোর হুকুমে ভারত সরকার এদেশে বিটি বেগুন নিয়ে এসেছিল। কেরালা সরকারতো ইতিমধ্যে তাদের রাজ্যে, জিন খাদ্য ও ফসল নিষিদ্ধ করেছে। সময় এসেছে ভারত সরকারের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার যে, নিরাপদ খাদ্যের ব্যাপারে মানবাধিকার কোনোমতেই লঙ্ঘন হতে দেওয়া যাবে না।

'জৈব সন্ত্রাসবাদের' মহড়া —মহেশ ভাট

প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার সাহায্যে গ্রামের গরিব মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। সম্প্রতি সংগঠনটির উদ্যোগে কলকাতায় প্রখ্যাত চিত্র নির্মাতা ও সমাজসেবী শ্রী মহেশ ভাট তার নতুন ছবি 'পয়জন অন দ্য প্ল্যাটার' ছবিটির প্রদর্শন করলেন। ছবিটির পরিচালক অজয় কাঞ্চন। এর আগে ভুবনেশ্বরে ছবিটি দেখানোর সময় মহেশ ভাট বলেন, দেশের নীতি–নির্ধারক সংস্থাগুলির সঙ্গে বহুজাতিক বায়োটেক কোম্পানিগুলির অশুভ আঁতাত জন্ম দিয়েছে বায়ো-টেররিজম বা জৈব আতঙ্কবাদের। ভারতের খাদ্য ও কৃষিক্ষেত্রের বহু কোটি ডলার মূল্যের বাজার দখলে তারা আজ এতটাই বেপরোয়া যে, জিন খাদ্য ও ফসলের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে বিজ্ঞানীদের বারংবার হুঁশিয়ারিকেও তারা আমলই দিচ্ছে না। শ্রী ভাটের মতে, যে কোনও কিছুর চাইতেই এই নয়া প্রযুক্তির অপব্যবহার চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রেহাই পাবে না কেউ। জিন–খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিধিনিষেধ যে কতখানি আলগা, ছবিটিতে তুলে ধরা সুপার মার্কেটগুলিতে থরে থরে সাজানো এইসব খাদ্যবস্তুই তার প্রমাণ। বিভিন্ন দেশে প্রাণীদের উপর জিন খাদ্য ও ফসলের পরীক্ষানিরীক্ষায় ধরা পড়েছে মস্তিষ্ক, ফুসফুস, লিভার, কিডনি ও পরিপাক যন্ত্রের ক্ষতি হওয়ার বিষয়টি। ইনস্টিটিউট অফ রেসপন্সিবল টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা এবং মানবদেহের উপব জিন ফসলের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে লেখা দুটি বিখ্যাত বইয়ের লেখক জেফ্রি এম স্মিথ জোর দিয়ে বলেছেন, জিন খাদ্য ও ফসলের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশেই সঠিক, নির্ভরশীল মূল্যায়ন হয়নি। সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজির প্রতিষ্ঠাতা–অধিকর্তা এবং সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিযুক্ত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটির সদস্য ড. পুষ্প এম ভার্গবের মতে, নিরাপদ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কমপক্ষে আগামী পাঁচ সাত বছর সবরকমের জিন খাদ্য ও ফসলের ব্যবহার ও বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ছবিটি দেখানোর পর যে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় তার সমাপ্তি ঘোষণা করে মহেশ ভাট বলেন, আমাদের স্বাস্থ্য ও জীবন নিয়ে এইরকম ছিনিমিনি খেলা চলবে, আর আমরা বোবা দর্শক হয়ে বসে থাকব তা হতে পারে না। যদি ভারত সরকার ও তার নীতি–নির্ধারক সংস্থাগুলি, বিজ্ঞানীদের সবরকম সতর্কবাণী উপেক্ষা করে জিন ফসলের উৎপাদন চালিয়ে যায়, তাহলে এমন আন্দোলন গড়ে তোলা হবে, যা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশ কখনও দেখেনি।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

Ajoy Kanchan : 9810184014; Devinder Sharma : 9811301857 or Write to poisononplatter@gmail.com

খাদ্যোপান্ত — ১৪/১১৪

সংসদে ঝড় উঠেছে। জিরো আওয়ারেই খাবার। প্যাকেট ভর্তি খানা কতটা খানদানি এবার তা বুঝে নেওয়া হবে। ফুড সেফটি ও স্ট্যান্ডার্ডস এজেন্সি এবং দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রক প্যাকেট খাবারের গুণমান বিচারের কিছু মাপকাঠি ঠিক করছে। মানে কাঠি দিয়ে কারচুপি মাপবে। ঠিক হয়েছে কেউ এই মান কণামাত্র ডিঙোলে তাকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হবে। বিধিভঙ্গ হলে খাবার-মালিকেরও দায়িত্ব থাকবে সেকথা জানানোর। সবমিলে, তদারকি এবার ভরপেট—চেটেপুটে।

তবে শেষ পাতে আরো আছে। সরকার এখানেই থামেনি। সে ঠিক করেছে সীমান্তেও চৌকি বসাবে। আমদানি-সামগ্রীকে এই মাপকাঠিতে পরখ করে তারপর দেশে ঢোকাবে বলে। পাশাপাশি, এই নতুন মান অনুযায়ী রাখা হবে এক বিজ্ঞানীদলও। যাঁরা আমদানি খাবারের ঝক্কি যাচাই করে নেবেন। অতএব এবার চেখে দেখা যাক স্বাদ কেমন!

ক্যাড বাড়াবাড়ি — ১৪/১১৫

ডেয়ারি মিল্ক থেকে সেলেব্রেশন হয়ে, সীসা আছে-সীসা নেই তর্ক ছাপিয়ে, ক্যাডবেরি মৃত্যুঞ্জয় এভাবেই চোখের খিদে–জিভের জল, টলমল হয়ে কেটে যাচ্ছিল বেশ।

কিন্তু এবার ঘরে অশান্তি। নিজের দেশেই ইংল্যান্ডের ক্যাডবেরিকে সবাই দাগি বলছে। ছটা রাসায়নিক রং ক্যাডবেরি ব্যবহার করবেনা বলে হলফ করেছিল। কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়েছে। এই ছয় রং, কিছু ছোটোর অস্থিরতা বাড়ার কারণ ছিল। তাহলে ক্যাডবেরি এখন ছয়ে ছত্রাখান। সাত রং মিশে রামধনু হয়। ছ রং মিশে...ছিঃ.ছিঃ রাম রাম।

চাই নিজ — ১৪/১১৬

চিনা খাবারের নামযশ আরো বাড়বে। কারণ হালে চিনারা খাবারের সাতসতেরোর মধ্যে একেবারে সতেরোকে জেনে গেছেন। এই সতেরোর কথা বলবার মতো নয়, কেবল নিষেধ করার মতো। এগুলো ফুড অ্যাডিটিভ মানে ফুডে অ্যাড করা হয়। কিন্তু অ্যাড করার কথা কারখানার, চাষজমিতে ও নর্দমা সাফ করতে এগুলো বাতিল হয়েছিল আগেই। এবার কুকীর্তিটা হল। স্বরণাক্ষরে লেখা হল। ছাপা হল। মানে তালিকাটা প্রকাশ পেল।

তালিকায় ভালো করে ভয় পাওয়ার অনেককিছুই আছে। প্রথমে বলি, বোরিক অ্যাসিড আছে। বোরিক অ্যাসিড লাগে খেতের পোকা মারতে। এখন নুডলস ও মিটবল স্বাদু করে ইন্ডাস্টিয়াল ফার্মালডিহাইড আছে। ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ফার্মাডিহাইড, বিভিন্ন সিফুড ভিজিয়ে তাজা ও বড় রাখতে লাগছে, এমনিতে লাগে সাবান তৈরি ও নর্দমা সাফাইয়ে। কোনো কোনো চিনা ডিশে আফিমের মতো জিনিসও মিশছে।

করছে–মিশছে বলছি কেন, বলা উচিত মিশতো, কারণ ওইসব অ্যাডটিভ চিনের খাবার থেকে এখন 'মার ঝাড়ু আচ্ছা মার'...অতএব চিনা খাবার চেনাই রইল। চিনে মাটির পুতুল থাকলেও, চিনারা তো আর পুতুল নয়।

আমরা, সার্ভিস সেন্টার, আমাদের মূল কাজ টেকসই চাষ। খাদ্য ও জীবিকা সুনিশ্চিত করা। আমরা জলবায়ুর পরিবর্তনের অনিশ্চিত দুর্যোগ সহ্য করার কথা ভাবি এইভাবে। এই দিনলিপির পাতায় পাতায় সেইসব কাজের হদিস।

মূল্য : ৫০ টাকা

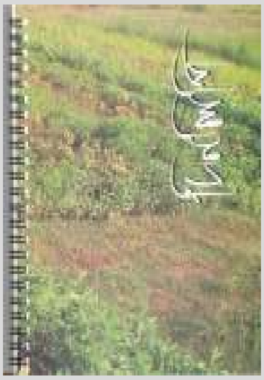

যোগাযোগ | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ :** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)

সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস

সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু